দ্বীন

এস এম নাহিদ হাসান

পেনফিল্ড পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

জীবনের উদ্দেশ্য ও বিষয় ১৪

উদ্দেশ্য ও বিধেয় ১৪

দুনিয়া ও আখিরাত বিস্তৃতি ও গুরুত্ব ১৮

সফলতা কী ও কীভাবে ২১

পেশা ও জীবনবোধ ২৫

একদিন তো জান্নাতে যাবই ৩৪

আখিরাতের বিশেষ প্রস্তুতি ৩৯

হতাশ হবেন না ৪৩

জ্ঞান ও কর্ম ৪৬

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য ৪৮

জ্ঞান অর্জনের উপায় ৪৯

জ্ঞান অর্জনে ভারসাম্য ৫৩

জ্ঞান অর্জনের ধারাবাহিকতা ৫৩

জ্ঞানের সংজ্ঞা ও শুদ্ধতা ৫৫

অনুমান, অনুসন্ধান ও দলিল ৬২

ভালো-মন্দের আপেক্ষিকতা ৬৭

মুক্তবুদ্ধি ও তার পরিণাম ৭০

জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ৭৪

জ্ঞানপাপী ৭৫

কালিমার অর্থ, শর্ত ও দাবি ৭৮

কালিমার অর্থ

কালিমার শর্ত ও দাবি ৮৫

আল্লাহর ওপর ঈমান ৯৭

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলি ১০০

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত অবস্থান ১১৭

তাওহিদ ও শিরক ১৩৩

তাওহিদের গুরুত্ব ও শির্কের ভয়াবহতা ১৩৩
তাওহিদ সম্পর্কিত বিশ্বাস ও কর্ম ১৩৬
শির্ক সম্পর্কিত কিছু বিশ্বাস ও কর্ম ১৫২
কিতাবের ওপর ঈমান ১৫৯
কিতাব কী ও কেন? ১৫৯
কিতাবের ওপর ঈমানের স্বরূপ ১৬১
কুরআন বোঝার মূলনীতি ১৭০
রিসালাতের ওপর ঈমান ১৭২
রিসালাত কী ও কেন? ১৭২
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমানের স্বরূপ ১৭৫
রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত কিছু বিশ্বাস ১৮১
আখিরাতের ওপর ঈমান ১৮৭
কবর ১৯৩
পুনরুত্থান ১৯৬
হাশরের মাঠের অবস্থা ১৯৬
মিযান ১৯৯
ফলাফল প্রকাশ ২০০
জান্নাত ও জাহান্নাম ২০১
ইবাদাত, সুন্নাহ ও বিদআত ২১৯
ইবাদাত ২১৯
সুন্নাত ২২৫
বিদআত ২২৬
ফিকহ ২৩৩
সংজ্ঞা ও উৎস ২৩৩
ফিকহের উৎস ২৩৫
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ২৩৭
ফিকহি সিদ্ধান্তে মতবিরোধ ২৬০
মতবিরোধের কারণ ২৭৫
মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ২৮২
হাদিস অধ্যয়ন ও অনুসরণ ২৮৭

দয়ীফ হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা ২৮৮
হাদিসের কিতাব ও সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ২৯১
সাধারণ মানুষের হাদিসপাঠ ও আমল ২৯৪
আত্মশুদ্ধি ২৯৮
আত্মশুদ্ধি কী? ২৯৮
আত্মশুদ্ধি কীভাবে ২৯৯
আত্মশুদ্ধির ধাপসমূহ ৩০১
শুদ্ধ আত্মার পরিচয় ৩০৪
ব্যক্তি, সমাজ ও ইসলাম ৩০৬
দ্বীন ও দুনিয়া ৩০৬
রাজনীতি ও ইসলাম ৩০৮
রাষ্ট্র-গঠনে ইসলামী নির্দেশনা ৩০৯
রকমারিবাদ ও ইসলাম ৩২৫
সংস্কৃতিবাদ ৩২৬
অনৈতিক জাতীয়তাবাদ ৩২৮
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম ৩২৯
মুসলিমদের বিভক্তি ও ঐক্য ৩৩১
বিভক্তির ধরন ৩৩২
বিভক্তির কারণ ৩৩৩
মুসলিম উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা ৩৩৭
দাওয়াত ও তাবলীগ ৩৪২
তাবলীগ কী ৩৪২
তাবলীগ কেন ৩৪৩
তাবলীগের লক্ষ্য ৩৪৭
তাবলীগের বিষয় ৩৪৯
তাবলীগের পদ্ধতি ৩৫৪
ফলাফল ও প্রাপ্তি ৩৬৪
বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ৩৬৮
বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ৩৭১
অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার ৩৭৫

জিহাদ ও চরমপন্থা ৩৭৯
অর্থ ও সংজ্ঞা ৩৮৫
প্রেক্ষাপট ও শর্ত ৩৯০
আক্রমণাত্মক জিহাদের শর্ত ৩৯৭
মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? ৩৯৯
ফিতনা-ফাসাদের যুগ ৪০৩
ফিতনা আসবেই ৪০৩
এখন কি ফিতনার যুগ? ৪০৪
ফিতনার সময় করণীয় ৪১২
মুক্তির যুগ : ইমাম মাহদি, ঈসা আ. ও দাজ্জাল ৪১৭
ইমাম মাহদির আগমন ৪১৭
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ৪২১
ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ৪৩২

আমরা আলোচনা করব মুমিনের পেশা নির্বাচন ও অবলম্বনের প্রকৃতি নিয়ে। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জীবনবোধের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনবোধই ঠিক করে তার কর্মের গতি-প্রকৃতি। কেননা মানুষ এটা বিচার-বিশ্লেষণ করেই তার মর্যাদা নির্ণয় করে। উচিত না হলেও সমাজব্যবস্থা এমনটাই বলে।

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের মূল্যবোধ সাধারণত আখিরাতমুখী নয়; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমদের পেশা নির্বাচনের মূল কারণ দুটি—

১. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা;

২. সামাজিক পরিচিতি, ক্ষমতা বা লৌকিকতা।

মানবিক বা সামাজিক দায়বদ্ধতা এখানে গৌণ। 'মানব ধর্মের' অনুসারীরাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

ছোটো বেলায় 'Aim in life' রচনা লেখেননি, এমন শিক্ষিত লোক বিরল। মনে পড়ে, সেখানে কী লিখেছিলাম?

৬০% ডাক্তার, ৩০% প্রকৌশলী, ৫% শিক্ষক (তার মধ্যে ১% সত্যিকারার্থে)—এ-জাতীয় কিছু হয়ে কে কীভাবে সমাজসেবা করবে, তা-ই ছিল মুখ্য বিষয়।

বিশ্বাস করুন, সমাজসেবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। মুখ্য হলো অর্থ। যা-ই হোক, জানা কথা জানিয়ে লাভ নেই; তবু প্রমাণ হিসেবে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—নিয়মিত ধর্মকর্ম করে, এমন কিছু লোককে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন—কে এই সমাজের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি? কে পার্থিব জীবনে সবচেয়ে সফল?

সে হয়তো বলবে—'যে ব্যক্তি নামাজ-কালাম পড়ে, সৎ ও ধার্মিক, আখিরাতে জান্নাত পাবে, সে-ই তো সৌভাগ্যবান'। সে-হিসেবে মসজিদের ইমাম-খতিব মুয়াজ্জিনেরই এই কাতারে থাকার সুযোগ বেশি। এবার খোঁজ নিয়ে দেখুন তো, তার পাঁচ পুত্রের কয়জনকে মসজিদের ইমাম বানাতে চেয়েছেন!

এই হলো ধার্মিকের সত্যবাদিতার নমুনা।

'আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন—রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে জড়িত ১০ প্রকার ব্যক্তিকে লানত করেছেন। মদ প্রস্তুতকারী, মদের ফরমায়েশ দানকারী, মদপানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, যে মদ পান করায়, মদ বিক্রেতা, মদের মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রয়কারী, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।'[৪১]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'তারা সবাই সমান'।"[৪২, ৪৩]

হালাল-উপার্জন ইবাদাত কবুলের শর্ত। সুতরাং, পেশা হালাল হওয়ার কোনো বিকল্প নেই—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

---

[৪১] সুনানুত তিরমিযী : ১২৯৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৫০৬ [হাদিসের মান : হাসান]

[৪২] সহিহ মুসলিম : ১৫৯৮

[৪৩] উল্লিখিত হাদিসে সবাইকে সমান বলার অর্থ কী, এর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ফকীহ ও হাদিস বিশারদ মোল্লা আলী ক্বারী রহিমাহুল্লাহ তার *'মিরকাতুল মাফাতিহ'* গ্রন্থে লিখেছেন—'هُمْ سَوَاءٌ' 'সবাই সমান' কথাটির অর্থ হলো, মৌলিক গুনাহে সবাই সমান অংশীদার হবে; যদিও শাস্তির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। [মিরকাতুল মাফাতিহ : ৬/৪৩] –ভাষা সম্পাদক

হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো সত্যত্যাগী কোনো খবর নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, তখন তোমরা যাচাই করে দেখবে—পাছে অজান্তে তোমরা কোনো লোকদলকে আঘাত করে বসো, আর পরক্ষণেই দুঃখ করো তোমরা যা করেছ, সেজন্য।[১৭]

ভালোমন্দের আপেক্ষিকতা

ভালো-মন্দ একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। ঈমানের দৃষ্টিতে যা ভালো, কুফরের দৃষ্টিতে তা ভালো না-ও হতে পারে। যেমন, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলাম কখনোই কাফিরদের কাছে ভালো নয়। ইসলামের আইনকানুন-বিধিবিধান তাদের কাছে বর্বর, অথচ মুমিনের কাছে সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এমনকি আমাদের মুসলিম সমাজেই আপনি যদি বলেন—নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বর্জন করতে হবে, পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে, বিচারব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াহ অনুসরণ করতে হবে, সুদভিত্তিক অর্থনীতি বর্জন করতে হবে, সংস্কৃতির নামে শির্ক-বিদআত নির্মূল করতে হবে—তাহলে দেখা যাবে, সবাই আপনার আহ্বানকে স্বাগত জানাচ্ছে না; বরং তারা আপনার ওপর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে আপনাকেই দোষারোপ শুরু করবে।

অথচ আপনি যে-দাবিগুলো করছেন, সেগুলো সবই কুরআন-হাদিস থেকে উদ্ভূত এবং ইসলামের বাইরে কিছু নয়। বিরুদ্ধবাদীরা 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' যদি বিশ্বাসই করতো, তাহলে তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কেন? তখন তাদের মনে পড়ে যায় 'ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র'! তার মানে কি এই যে, ইসলাম কেবল ব্যক্তির শান্তি আনতে পারে, কিন্তু সমাজব্যবস্থায় তার কোনো কর্তৃত্ব নেই?

সবাই তার ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর ইসলামে তো এ-কাজটি করতে আদেশ করা হয়েছে। আজ বিশ্বজুড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গেলেও 'সন্ত্রাসী' তকমা গায়ে লেগে যায়। আজ জালিমরা হয়েছে ইনসাফকারী, আর নির্যাতিতরা হয়েছে সন্ত্রাসী। মূলত তারা ইসলামকে মুখে

[১৭] সূরা হুজুরাত : ৬

শান্তির ধর্ম বললেও অন্তরে সন্ত্রাসের ধর্ম বলেই বিশ্বাস করে। পূর্বেও যখন মুমিনগণ কাফিরদেরকে ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছে, তখন তারা উল্টো নিজেদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী দাবি করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ.

আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি কোরো না; তখন তারা বলে, আমরাই তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।[১৪২]

এ-সকল লোক নিজেদের জ্ঞানী ও সত্যপন্থী মনে করে, অথচ তারা অজ্ঞতা ও শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ.

আর মানুষদের মধ্যে এমনও আছে, যে কোনো জ্ঞান না রেখেই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, আর সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানকে।[১৪৩]

এমনকি মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো জালিম ফিরাউনও নিজেকে সংশোধনকারী আর মূসা আলাইহিস সালামকে বিপর্যয়কারী হিসেবে প্রচার করেছিল।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ.

আর ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি মূসাকে বধ করতে পারি। আর সে তার আল্লাহকে ডাকতে থাকুক; নিঃসন্দেহ আমি আশঙ্কা করছি যে, সে তোমাদের ধর্মমত বদলে দেবে, অথবা সে দেশের মধ্যে বিপর্যয়ের প্রসার করবে।[১৪৪]

---

[১৪২] সূরা বাকারাহ : ১১,১২

[১৪৩] সূরা আলি ইমরান : ২২

[১৪৪] সূরা গাফির : ২৬

ফিকহের উৎস

১. কুরআন ও তার ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার বাণী আল-কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস, নাজিল হওয়ার পর থেকে যা অবিকৃত আছে। তবে কুরআনের আয়াতসমূহের তাফসিরে মতভেদ রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রথমত কুরআনের অপর কোনো আয়াত থেকে, অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, অতঃপর তাঁর সাহাবাদের থেকে নিতে হবে। কোনো সাহাবার ব্যক্তিগত তাফসির বা মতামত সাহাবাদের ঐকমত্যের বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. হাদিস ও তার ব্যাখ্যা

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কেবলমাত্র সহিহ হাদিসগুলোই ফিকহের উৎস হিসেবে বিবেচ্য। অবশ্য সহিহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ থাকতে পারে। আর যেসব ক্ষেত্রে কোনো সহিহ হাদিস পাওয়া যাবে না, সেসব ক্ষেত্রে উসূলুল হাদিস বা হাদিসের মূলনীতি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কুরআনের মতো হাদিসের ব্যাখ্যাও সালাফে সালিহিনের থেকে নিতে হবে। কোনো সাহাবার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা মতামত ইজমায়ে সাহাবার বিপরীত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. ইজমা

'ইজমা' শব্দটি 'জামউন' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো—সংগ্রহ, একত্রীকরণ ইত্যাদি। পারিভাষিকভাবে শরীয়াতের কোনো হুকুমের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের (ইসলামী পণ্ডিত বা গবেষকদের) একমত হওয়াকে ইজমা বলে। ইসলামী শরীয়াতে ইজমা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা কোনো বিষয়ে উম্মাহর অধিকাংশ আলিমের ইজতিহাদ ভুল হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।[৫৭১] তবে 'ইজমা' তখনই শরীয়াত বলে বিবেচিত হবে, যখন তা নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করবে—

---

[৫৭১] এ-প্রসঙ্গে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য, যেখানে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ'—আমার উম্মাত কখনোই গোমরাহীর উপর ঐকমত্য পোষণ করবে না। [শব্দের ভিন্নতায় এ-মর্মে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসদের

- ইজমা কখনোই কুরআন ও হাদিসের বিরোধী হবে না;
- যাদের মতামতের ওপর ইজমা হবে, তাদের সকলকে নেককার মুজতাহিদ হতে হবে;
- সাহাবা-পরবর্তী কালের কোনো ইজমা সাহাবাদের ইজমার বিপরীত হতে পারবে না।

৪. কিয়াস

কিয়াসের অর্থ হলো অনুমান করা, পরিমাণ করা, তুলনা করা, সাদৃশ্য করা ইত্যাদি। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনেরও পরিবর্তন ঘটে। দেখা যায় নতুন সমস্যা। এসকল নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য গবেষণার সুযোগ আছে। আর এর নাম হলো কিয়াস। যেমন—খলিফা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু একবার শাসনকার্যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে ইরাকের একাধিক অঞ্চলের গভর্নর আবু মূসা আশআরী রদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানো এক চিঠিতে বলছিলেন, "যে মাসআলার ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে কোনো দলিল নেই তা তোমার কাছে পেশ করা হলে তুমি সেসব বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কিয়াস বা পারস্পরিক তুলনা করবে এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে। তারপর তোমার জ্ঞানানুসারে যা আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় এবং হকের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তার ওপরই নির্ভর করবে।"[৫৭২]

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এর মতে, "কিয়াস হলো আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরাসরি স্পষ্ট হয় না, তখন মূল আইন থেকে ইল্লাতের (অর্থাৎ, কারণ বা যুক্তির) মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। এখানে আইনের যে বিস্তৃতি হয়, তা-ই হলো কিয়াস।"

শাফিয়ী ফকিহগণ বলেন, "একটি পরিচিত জিনিসের সাথে অন্য একটি পরিচিত জিনিসের ইল্লাতের মাধ্যমে সমন্বয় করা হলো কিয়াস।"

মতে এগুলোর সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও মর্ম সহিহ, কারও মতে হাসান। দেখুন—সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৫০; সুনানুত তিরমিযী : ২১৬৭; সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫৩] –ভাষা সম্পাদক

[৫৭২] ইমাম বাইহাকী, আল-খিলাফিয়্যাত : ৭/৪৫৬-৫৭, হাদিস নং : ৫৫১৭; ইমাম সুয়ূতী, জামিউল আহাদিস : ২৮/১৮১, হাদিস নং : ৩০৯২৪। –ভাষা সম্পাদক

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি কী?

দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়।[৬৮৭]

আত্মশুদ্ধি বলতে অনেকে আত্মার শুদ্ধি বুঝলেও, মূলত আত্মশুদ্ধি হলো নিজের সমগ্র সত্তার শুদ্ধি।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

সাবধান! নিশ্চয় শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে, যখন তা ঠিক থাকে, তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়, আর এটি হচ্ছে কলব।[৬৮৮]

মানুষের সত্তা মূলত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়—শরীর বা বদন, আকল বা বুদ্ধি এবং রুহ বা নাফ্‌স। শরীর আর বুদ্ধির ব্যাপারটা সবাই অবগত হলেও রুহ বা নাফসের সাথে হয়তো সবাই অতটা পরিচিত নয়। রুহের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[৬৮৭] সূরা শাম্‌স : ৯-১০

[৬৮৮] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৮৪ [হাদিসের মান : সহিহ]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

লোকেরা আপনাকে রুহ বা আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায়। আপনি বলে দিন—রুহ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের নির্দেশ মাত্র। এ-বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।[১৮১]

যেহেতু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই এ-বিষয়ে সামান্য কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আমরা আর বেশি কী করে জানব! সহজ কথায়, রুহ হলো আল্লাহর একটি নির্দেশ মাত্র; যার উপস্থিতি মানবদেহে প্রাণের সঞ্চার করে। রুহ আর নাফ্স একই বিষয় কি-না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে—রুহ আর নাফ্স একই প্রাণসত্তার দুটি নাম কিংবা দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থা। মানুষের জীবদ্দশায় শরীর ও রুহ সর্বদা উপস্থিত থাকলেও আকল থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। একজন পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে তিনটি সত্তাই বিরাজমান। নিজেকে শুদ্ধ করতে হলে এ তিন সত্তাকেই শুদ্ধ করতে হবে।

আত্মশুদ্ধি কীভাবে

আত্মশুদ্ধির কথা উঠলেই আমাদের মনে এক ধরনের চিত্র ফুটে ওঠে যে, দুনিয়া ত্যাগ করে একাকী ঘরের কোণে বসে যাওয়া কিংবা হঠাৎ করে জঙ্গলে চলে যাওয়া; অথবা সকাল-সন্ধ্যা অদ্ভুত স্টাইলে কিছু যিকির-আযকার করা, তাই না?

এবার আপনি খেয়াল করুন তো—দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শুদ্ধ যে মানুষগুলো ছিল, অর্থাৎ নবী-রসূলগণ, তারা কি কখনো আত্মশুদ্ধির জন্য এ কাজগুলো করেছেন? আচ্ছা, তাদের বাদ দিলাম; তাদের অনুসারী মহান সাহাবিগণ কীভাবে শুদ্ধ হয়েছিলেন? কীভাবে আমরা নিজেকে শুদ্ধ করতে পারি?

সহজ উত্তর। দ্বীন মানতে হবে। দ্বীন মানার মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি। আরেকটু স্পেসিফিক্যালি বললে, দ্বীনের তিনটি অংশ মানব সত্তার এ তিন দিককে শুদ্ধ করে। দ্বীনের প্রথম বিষয় ইসলাম, যা আমাদের শরীরকে পবিত্র করে।

---

[১৮১] সূরা বানি ইসরায়িল : ৮৫

কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের প্রয়োজন? তার চেয়ে কে ভালো জানেন কল্যাণকর বিধানের কথা? মানুষ মানুষের জন্য স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও সর্বজনীন আইন রচনা করতে পারে না, মূলত মানব মস্তিষ্ক এ কাজের উপযুক্তই নয়।

রাষ্ট্র গঠনে ইসলামী নির্দেশনা

এটা কখনোই সম্ভব নয় যে—ইসলাম রাজনীতি বা সামাজিক, মানবাধিকার ও বিচার বিভাগীয় কাজের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করবে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোনো চিন্তা বা হস্তক্ষেপই করবে না। বরং সামগ্রিকভাবে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিবিধানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—বিধান প্রণয়নকারীর ইচ্ছা হলো, ইসলামী সমাজে একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও সরকার গড়ে উঠুক এবং একদল লোক থাকুক, যারা সঠিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এ আইনসমূহকে বাস্তবায়নের মহান দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে। এর মাধ্যমে জনগণের মাঝে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। বন্ধ হবে একাধিক ও বিশৃঙ্খল সরকার সৃষ্টির পথ। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো—

১. শাসক বা নেতৃত্ব নির্বাচন

একটা জাতি কখনোই নেতা, ইমাম বা দলনেতার আনুগত্য ছাড়া চলতে পারে না। নেতাহীন জাতি বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হতে বাধ্য। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর শুরু থেকেই প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের মধ্য থেকে এক একজন নেতা নির্ধারণ আবশ্যকীয় করেছেন, যার নেতৃত্বে তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

পূর্বে নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া ছিল নবুওয়াত, যা ওহী দ্বারা নির্ধারিত হতো। নেতা নির্ধারণের এ আসমানী প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সর্বশেষ নেতা ছিলেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার ইন্তিকালের পর শুরু হয় মানুষের রায় দ্বারা নেতা বা শাসক নির্বাচন। ইসলামে এ শাসককে বলা হয় খলিফা।

শাসক বা খলিফা নিয়োগের বাস্তব পদক্ষেপসমূহ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেরকমটি হয়েছিল খুলাফায়ে রশিদীনের সময়ে—যারা আল্লাহর রসূলের ইন্তিকালের পরপরই মুসলিম জাতির খলিফা হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। যেমন : আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রদিয়াল্লাহু আনহুম। এ সমস্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে সকল সাহাবি রদিয়াল্লাহু আনহু নীরব থেকে তাদের স্বীকৃতি ও সম্মতি

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা

ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেছেন, "ঈমানের ঘোষণা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—এর দাবি হচ্ছে, তুমি শুধু আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসবে, কাউকে শুধু আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে। নিজেরা বন্ধুত্ব করবে আল্লাহর জন্য, কারও সাথে শত্রুতা ঘোষণা করবে শুধু আল্লাহর জন্য। এর দাবি হচ্ছে—তুমি তা-ই ভালোবাসবে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন; তুমি তা-ই ঘৃণা করবে, যা আল্লাহ ঘৃণা করেন।"[৮৪৭]

অর্থ ও গুরুত্ব

'আল-ওয়ালা'-এর আভিধানিক অর্থ হলো—ভালোবাসা, বন্ধুত্ব করা, সাহায্য করা, অনুসরণ করা। শারয়ী পরিভাষায় এর অর্থ হলো—শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে, তাঁকে ভালোবেসে কথা, কাজ ও বিশ্বাসে সম্পূর্ণ একমত হওয়া। 'আল-বারা'-এর আভিধানিক অর্থ হলো—ত্যাগ করা, দূরে থাকা ইত্যাদি। শারয়ী পরিভাষায় এর অর্থ হলো—ওই সমস্ত কিছুর সাথে বিরোধিতা করা, ভিন্নমত পোষণ করা, যা আল্লাহ ঘৃণা করেন এবং দোষারোপ করেন। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' হলো, ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঈমানের পূর্ণতার জন্য এটি আবশ্যিক।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ.

---

[৮৪৭] ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ইহতিজাজ ফিল কদর, পৃষ্ঠা : ৬২

ফিতনা-ফাসাদের যুগ

ফিতনা আসবেই

'ফিতনা' শব্দটি বিপদাপদ, বিশৃঙ্খলা, পরীক্ষা করা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে শেষ যুগে শব্দটি মূলত অপছন্দনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ উম্মাতের প্রথম যুগের মুমিনদেরকে ফিতনা থেকে হেফাজতে রাখা হয়েছে। আখিরি জমানায় এই উম্মাতকে বিভিন্ন ধরনের ফিতনায় ও বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হবে। প্রবৃত্তির অনুসরণ ফিরকাবন্দি এবং দলাদলির কারণে ফিতনার সূচনা হবে। এতে সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে যাবে এবং ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে। একে অপরের ওপর তলোয়ার উঠাবে। ব্যাপক রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটবে। [মুসলিম, কিতাবুল ফিতান]

ফিতনাগুলো হবে একটি অপরটির চেয়ে অধিক ভয়াবহ। এমনকি ফিতনায় পড়ে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

নিশ্চয়ই কিয়ামাতের পূর্বে অন্ধকার রাত্রির মতো ঘন কালো অনেক ফিতনার আবির্ভাব হবে। সকালে একজন লোক মুমিন অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হবে। বিকালে সে কাফিরে পরিণত হবে। বহু-সংখ্যক লোক ফিতনায় পড়ে দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে তাদের চরিত্র ও আদর্শ বিক্রি করে দেবে।[১৫০]

---

[১৫০] সহিহ মুসলিম : ১১৮

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্যই ফিতনার যুগ সম্পর্কে বর্ণনা করে গেছেন। সুতরাং, আমাদেরকে উক্ত হাদিসগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে নিজেদেরকে ফিতনা থেকে দূরে রেখে চলা সম্ভব হয়।

এখন কি ফিতনার যুগ?

আমরা যে-যুগে বসবাস করছি, সেটাই ফিতনার যুগ কি-না তা বোঝার জন্য ফিতনার যুগের বৈশিষ্ট্যগুলো জানা ও বোঝা জরুরি। এ-ব্যাপারে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস আমরা এ-বইয়ের শুরু থেকে প্রাসঙ্গিক একাধিক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এ-পর্যায়ে আমরা প্রাসঙ্গিক হওয়ায় কিছু হাদিসের পুনরাবৃত্তিসহ ফিতনার যুগের আলোচনা সংবলিত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য হাদিস উল্লেখ করছি।

১. ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি—

আবু উমামা আল-বাহিলী রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ.

ইসলামের কড়াগুলো একটি একটি করে ভেঙে যাবে। একটি ভেঙে যাওয়ার পর মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। সর্বপ্রথম যে কড়াটি ভাঙবে, সেটি হলো (ইসলামী) শাসনব্যবস্থা, আর সর্বশেষটি হলো নামাজ।[১৩১]

অন্য এক হাদিসে তিনি আরও বলেন—

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ

[১৩১] সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪৮৬৬, মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক পুরুষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে কানা এবং আঙুর ফলের মতো ফোলা।[১৬৯]

বিভিন্ন হাদিসে দাজ্জালের চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে কেবল বলা হয়েছে, দাজ্জাল অন্ধ হবে। কোনো হাদিসে নির্দিষ্ট করে ডান চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আবার কোনো হাদিসে এসেছে, তার বাম চোখ হবে অন্ধ। মোটকথা তার একটি চোখ অন্ধ হবে। তবে ডান চোখ অন্ধ হওয়ার হাদিসগুলো *'বুখারী-মুসলিম'*-এ বর্ণিত হয়েছে। দাজ্জালের অন্যান্য লক্ষণগুলো কারও কাছে অস্পষ্ট থেকে গেলেও অন্ধ হওয়ার বিষয়টি কারও কাছে অস্পষ্ট হবে না।

তাছাড়া দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড়ো আলামত হলো, তার কপালে কাফির (كافر) লেখা থাকবে।[১৭০] অপর বর্ণনায় আছে—তার কপালে (ك ف ر) এই তিনটি বর্ণ লেখা থাকবে। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে। অপর বর্ণনায় আছে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে। মোটকথা আল্লাহ মুমিনের জন্য অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেবেন। ফলে, সে দাজ্জালকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে।

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে?

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ فَفَرِحْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَذَفَتْهُمْ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ

[১৬৯] সহিহুল বুখারী : ৭১২৮

[১৭০] সহিহুল বুখারী : ৭১৩১

খোরাসান।[১৭৪] সেখান থেকে বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশতাগণ সেদিন মক্কা-মদিনার প্রবেশপথসমূহে তরবারি নিয়ে পাহারা দেবেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

خُرَاسَانُ لَهَا يُقَالُ بِالْمَشْرِقِ أَرْضٍ مِنْ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ

'দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে পূর্ব দিকের একটি অঞ্চল থেকে, যাকে বলা হয় খোরাসান।'[১৭৫]

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে—

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল দাজ্জালের পরিচয় ও ভয়াবহতা জানিয়ে সতর্কই করেননি, বরং দাজ্জালের ফিতনা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছেন। উম্মাতকে একটি সুস্পষ্ট দ্বীনের ওপর রেখে গিয়েছেন তিনি। সকল প্রকার কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সতর্ক করেছেন সকল অকল্যাণের পথ থেকে। উম্মাতের ওপর যেহেতু দাজ্জালের ফিতনাই হবে সবচেয়ে বড়ো মুসিবত, তাই তিনি এ-ফিতনা থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং দাজ্জালের লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন—যাতে মুমিন বান্দাদের জন্য এ প্রতারক, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যুককে চিনতে কোনোরূপ অসুবিধা না হয়।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতকে যেসব দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তার অন্যতম কয়েকটি হলো—

---

[১৭৪] খোরাসান কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা শহরের নাম নয়; বরং খোরাসান বলতে একটি বিশাল অঞ্চলকে বোঝায়। ঐতিহাসিকভাবে বৃহদার্থে বর্তমান ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের একটি বড়ো অংশকে এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। যার উত্তরসীমায় ছিল আমু দরিয়া, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণ দিকে মধ্য-ইরানের মরু অঞ্চল, আর পূর্বে ছিল মধ্য-আফগানিস্তানের পার্বত্য মালভূমি। ইসলামী ইতিহাসে, বিশেষ করে উমাভী ও আব্বাসী খিলাফাতের আমলে নিশাপুর, মার্ভ, হিরাত ও বাল্‌খকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলকে চারটি বড়ো প্রশাসনিক এলাকায় ভাগ করা হয়। তখন থেকে খোরাসান বলতে এ-চারটি এলাকা ও এর আশপাশের কিছু অঞ্চলকেই বোঝানো হয়। –ভাষা সম্পাদক

[১৭৫] সুনানুত তিরমিযী : ২২৩৭ [হাদিসের মান : হাসান]